মস্তিষ্ক যখন রাউটার

সুমন ইসলাম

আমাদের দেহের সব কিছুর মূলে রয়েছে মাথা। আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বলা যায় মস্তিষ্কের কথা। মানবদেহের সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে মস্তিষ্ক। বিজ্ঞানীরা তাই এই মস্তিষ্ককে কেন্দ্র করেই চালিয়েছেন বহু গবেষণা, পর্যবেক্ষণ। জটিল মস্তিষ্কের বহু তথ্য এখন তাদের হাতের মুঠোয়। একটু গড়বড় হলেই চিকিৎসাসেবা দিয়ে রক্ষা করা যাচ্ছে মস্তিষ্ককে। অবশ্য মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণের সব উপায় এখনো উদ্ভাবিত হয়নি। আর তাই পারকিনসন বা আলঝেইমার্সের মতো মস্তিষ্কজনিত রোগের চিকিৎসাব্যবস্থা নেই চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের হাতে। তবে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। একদিন নিশ্চয়ই এ ধরনের রোগের চিকিৎসাব্যবস্থা উদ্ভাবিত হবে। ধাপে ধাপে সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। ইতোমধ্যেই অনেক সাফল্য ধরা দিয়েছে তাদের ঝুড়িতে। মানবদেহের সবচেয়ে জটিল অংশ মস্তিষ্ককে মোটামুটি ভালোভাবেই বুঝতে শুরু করেছেন তারা। এ সাফল্যের সুফল অবশ্যই পৌঁছে যাবে সাধারণ মানুষের দুয়ারে। মস্তিষ্ক যে প্রক্রিয়ায় কাজ করে, ঠিক একই প্রক্রিয়ায় কমপিউটার কাজ করে না। কমপিউটারের ক্ষেত্রে কাজের ধরনে ভিন্নতা রয়েছে। মস্তিষ্কের জটিল সংযোগ যদি কমপিউটারের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়, তাহলে একদিন কমপিউটারও ভাবতে শুরু করবে মানুষের মতো করেই। তবে সে সময়টা যে সহসাই আসছে না, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

বিষয়টি নিয়ে যারা কাজ করছেন, সেই গবেষকেরা বলছেন, অনেক সময় সাধারণ কোনো অঙ্ক করতে গিয়ে আমাদের শক্তিশালী মস্তিষ্ক হিমশিম খেয়ে যায়। খেই হারিয়ে ফেলায় হিসাব কষতে হয় বার বার। বিষয়টি তারা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন– ধরুন, আপনাকে হঠাৎ করে প্রশ্ন করা হলো ৩৫৭ গুণ ২৮৯ সমান কত? কাগজ-কলম এবং ক্যালকুলেটর ব্যবহার না করে এর উত্তর বের করা প্রায় অসম্ভব। কারণ, একটা গুণ করার পর দ্বিতীয় স্তরে গেলেই মনে থাকে না আগের স্তরের কথা। ফলে উত্তর পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু কাগজ-কলম কিংবা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করলে সহজেই এর উত্তর পাওয়া যাবে ১০৩১৭৩। এই মনে না থাকার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে গবেষকরা দেখেছেন, বিশ্বের সবচেয়ে জটিল একটি কাঠামো হলো মস্তিষ্ক।

স্নায়ুবিজ্ঞানী ফ্রয়েড ব্লুম বলেছেন, ওই জটিল মস্তিষ্কে কয়েক ট্রিলিয়ন সংযোগ রয়েছে। আর এ কারণেই অতি অল্পসময়ে তার পক্ষে জটিল গণনা ও অন্য সব কাজ করে ফেলা সম্ভব হচ্ছে। তার পরও গুরে ঘুরে মনে রাখার কোনো বিষয় হলে মস্তিষ্ক খেই হারিয়ে ফেলে। অথচ তার ক্ষমতা অসীম। বহু কিছু সে চিন্তা করতে পারে একই সময়ে। তা সত্ত্বেও তার পক্ষে সব কিছু একসাথে করে ফেলা সম্ভব হয় না। কিন্তু মস্তিষ্কের এত বিশাল ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেনো এমনটি হয়। বিষয়টি ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। আর তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন বিজ্ঞানীরা। তারা যেনো দেখেই ছাড়বেন, এমনটি কেনো হচ্ছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের স্বার্থেই এটা জানা জরুরি।

তারা ইতোমধ্যেই দেখেছেন, জনাকীর্ণ কোনো এলাকায় অবস্থান করা পরিচিত কোনো চেহারা খুঁজে পেতে আমাদের মস্তিষ্কের এক সেকেন্ডের কিছু ভগ্নাংশ প্রয়োজন হয় মাত্র। অথচ আজকের দিনের স্পর্শকাতর কমপিউটারেও ওই মানুষে চিহ্নিত করতে আরেকটু বেশি সময় প্রয়োজন হয়। তার পরও ৩৫৭-এর সাথে ২৮৯ গুণ করলে গুণ হয়, মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়ে মুখে মুখে তা করতে গিয়ে মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ে। ধাপে ধাপে কাজটি করতে গিয়ে সে আগের ধাপে কী ছিল, তা ভুলে যায়। তাই কিছুতেই তার পক্ষে প্রকৃত ফলাফলে পৌঁছা সম্ভব হয় না।

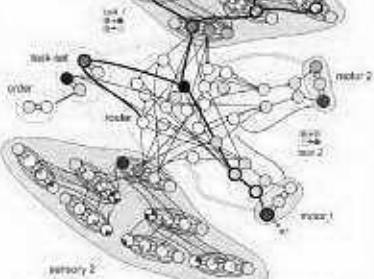

মনোবিজ্ঞানীরা এ ধরনের বিভ্রম বা খেই হারিয়ে ফেলাকে দেয়ালের ফাটল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলছেন, মনের একটা লুকানো জগৎ রয়েছে। সেখানে কখনো কখনো 'ট্রাফিক জ্যাম' তৈরি হয়। মস্তিষ্কের বিবর্তনের কারণেই এমনটা হয়ে থাকে। তাই অনেক জটিল কাজ সহজে ও দ্রুত করে ফেলতে পারলেও অনেক সহজ কাজে মস্তিষ্কে জটিলতার সৃষ্টি হয়। সে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে না।

মস্তিষ্কের এই ট্রাফিক জ্যামের কথা ১৯৩১ সালে করা এক গবেষণায় প্রথম ইঙ্গিত দেন মনোবিজ্ঞানী চার্লস উইট টেলফোর্ড। নর্থ ডাকোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই জরিপ করা হয়। তিনি ২৯ জন স্নাতক ছাত্রকে একটি টেলিগ্রাফ কীর সামনে বসান এবং নির্দেশনা দেন তারা যেনো কোনো শব্দ শোনার পর যত দ্রুত সম্ভব কী-তে চাপ দেয়। টেলফোর্ড আধা সেকেন্ড থেকে শুরু করে চার সেকেন্ড পর্যন্ত বিরতি দিয়ে শব্দ তৈরি করেন। তিনি দেখেন শব্দের বিরতির ওপর ছাত্রদের রেসপন্স পরিবর্তিত হচ্ছে। বিরতি যদি হয় ১ বা ২ সেকেন্ড, তাহলে ছাত্রদের রেসপন্স বা সাড়া দিতে সময় লাগে এক সেকেন্ডের চার ভাগের এক ভাগ সময়। কিন্তু বিরতি সময় যদি হয় আধা সেকেন্ড, তাহলে দেখা যায় ছাত্রদের রেসপন্স করতে একটু বেশি সময় প্রয়োজন হয়। মাসলের রিঅ্যাকশনের জন্য এমনটি হয়ে থাকে বলে গবেষকরা জানিয়েছেন। মস্তিষ্ক থেকে সঙ্কেত পাওয়ার পর মাসলে যে শকের সৃষ্টি হয়, তা থেকে বেরিয়ে এসে পরবর্তী কার্যক্রম করতে তার কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয়। এই সময়টাতেই মস্তিষ্ক খেই হারায় বলে অনুমান করা হয়। একটা শকের পর পরই যদি দ্বিতীয় শক দেয়া হয়, তাহলে কিছুই ঘটে না। কমপিউটারের ক্ষেত্রে এমনটি হয় না। কারণ, এর মধ্যে ডাটা প্রবেশ করানো হলে তা একা একাই ডিলিট বা মুছে যায় না। ফলে সে অঙ্কের ধারাবাহিকতা মনে রাখতে সক্ষম হয়। এককথায় বলা যায়, একটি চিন্তা করার পর অপর কোনো চিন্তা নিয়ে ভাববার আগে মস্তিষ্কের কিছুটা সময় অবশ্যই লাগে। টেলফোর্ডের এই গবেষণার ফল গত ৮০ বছর ধরে মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, কিন্তু একই ফল পাওয়া গেছে।

তাই বিজ্ঞানীরা বলছেন, দুটি কাজের মধ্যে যদি আমাদের মস্তিষ্ক যথেষ্ট সময় না পায় তাহলে পরের কাজটির গতি হবে খুবই ধীর। এই ধীর হওয়াকে বলা হয় সাইকোলজিক্যাল রেফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড। কখনো কখনো এই পিরিয়ড বা সময় মানুষের জন্য-মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। দুটি চিন্তা বা কাজের ক্ষেত্রে এই পিরিয়ড বাড়িয়ে পরীক্ষায় সুফল পাওয়া গেছে।

গবেষকেরা দেখেছেন, এই সাইকোলজিক্যাল রেফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড মানুষের মেন্টাল ক্লক বা দেহঘড়িকে থামিয়ে দেয়। তাই একটি কাজ পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী কাজ শুরু করা যায় না। মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে নিউরন থেকে সিগন্যাল বা সঙ্কেত নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ছড়িয়ে যায়। মনোবিজ্ঞানীরা এই নিউরনকে রাউটার বলে আখ্যায়িত করেন। রাউটার হচ্ছে এমন একটি প্রযুক্তিপণ্য, যা কিনা কমপিউটারের বিভিন্ন সিগন্যাল বা সঙ্কেত বিভিন্ন লোকেশনে পৌঁছে দেয়। মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে নিউরন এ কাজটি করে।

সব কিছু মিলিয়ে বিজ্ঞানীরা যে কথাটি বলছেন, তা হলো মস্তিষ্ক হচ্ছে মানুষের মাথার রাউটার। যার কাজ হলো সিগন্যাল বা সঙ্কেত বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া। মস্তিষ্কে যে ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি হয়, তা যুক্তিসঙ্গত কারণেই হয়ে থাকে এবং নির্দিষ্ট নিয়ম জানা থাকলে এই পরিস্থিতি উত্তরণ সম্ভব। মস্তিষ্কের মতো কমপিউটারকেও তাই কিছু নিয়ম মেনে পরিচালনার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। তারা বলছেন, কমপিউটারে কাজ করতে গিয়ে যদি একই সাথে অনেক কমান্ড বা নির্দেশনা দেয়া হয় তাহলে কমপিউটারও খেই হারিয়ে ফেলতে পারে। যার অনিবার্য পরিণতি কমপিউটার হ্যাং হয়ে যাওয়া। তাই নির্দেশনা দিতে হবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায়। অর্থাৎ একটার পর একটা করে। রাউটারকে কাজ করতে দিতে হবে সুষ্ঠুভাবে। একমাত্র সেক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে প্রকৃত সুফল। ■

ফিডব্যাক : sumonislam7@gmail.com